সংবাদ

তারিখ ..... 8 SEP 2004
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৬ ......

ফিচার

নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে শিক্ষা কমিশনগুলোর সুপারিশ পর্যালোচনা

ড. মো. আহসান কবীর

(গতকালের পর)

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। অথচ একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষার তাৎপর্য স্বাধীনতার এতটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সকলকে বুঝানোর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল কিনা বোধগম্য নয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু বক্তৃতা আর সেমিনারের মধ্যে বন্দি। নারীশিক্ষার জন্য বর্তমানে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছাতে আরও সময় দরকার। নারী শিক্ষা বিষয়ে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কমিশন রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আতাউর রহমান কমিশন

১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন সিনিয়র হাই স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদানের সুপারিশ করেন। তবে মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে এ কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি খুব প্রসারিত ছিল না। বিশেষত উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে কমিটি নীরব থেকেছে।

শরীফ কমিশন

১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান এসএম শরীফের নামানুসারে এ কমিশনের নাম হয় 'শরীফ কমিশন'। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে কমিটি রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ শেষ করে। এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, নারীশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে নারী ও শিশুর সমান অধিকার থাকবে। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ওই সময়ে শরীফ কমিশন নতুন কিছু ধারণা প্রদান করলেও মূলত এ কমিশন নারীশিক্ষায় সংকীর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে একেবারেই নীরব ছিল বলা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা সম্পর্কেও কমিশন স্পষ্ট কোন চিত্র তুলে ধরেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারীশিক্ষা

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন নামে গঠিত হয়। এ কমিশনে নতুন কিছু ছিল বলে মনে হয় না। শরীফ কমিশনের ন্যায় এ কমিশনও যখন গঠিত হয়, তখনও তথ্য প্রযুক্তির তেমন প্রসার ঘটেনি। এ সময় পশ্চিমা দেশগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। এর প্রবাহ কিছুটা হলেও প্রাচ্যের দেশগুলোতে নাড়া দিয়েছে। কাজেই কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে এর প্রতিফলন থাকাটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ছিল। আজকের দুনিয়া জুড়ে চলেছে বিজ্ঞানের অবাধ বিচরণ। বর্তমানে বা বিশ্বায়নের যুগে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে আরও উদার মনোভাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। উচ্চতর

আহমেদ একটি অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশে ৮০ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদ নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু সুপারিশ রাখেন। নারীর সার্বিক মুক্তির জন্য নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্ততপক্ষে দু'জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের একটি মূল্যবান সুপারিশ ছিল, নারীদের কেন্দ্র করে যাবতীয় কুসংস্কার দৃঢ়ভাবে বিলোপের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ রিপোর্ট বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। এ কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হলে হয়তো বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধান সম্ভব হতো। পৃথিবীর প্রতিটি পদক্ষেপে যখন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ১৯৯৬ সালে আর একটি কমিটি গঠন করা হয়। নারী শিক্ষা থেকে শুরু করে সকল দিক বিবেচনায় এনে কমিটিকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল।

নির্দেশনানুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপসহ নারীশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠনের কথা বলে। প্রাইভেট সেক্টরগুলোতে এ ব্যাপারে অনুদান দেয়ার জন্য উৎসাহিত করার কথাও কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়। কমিটি মনে করেছে, শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক হারে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যতিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি কমিটি নজর এড়িয়ে যায়নি। রিপোর্ট বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও অসহায় ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্তা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে কমিটি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছে ও সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছে।

নারী শিক্ষার প্রতি এ কমিটির উদ্দেশ্য যা ছিল তা বাস্তবসম্মত বলে

নারীশিক্ষা ছাড়া উন্নত সমাজ নির্মাণ সম্ভব নয়। যেখানে সমাজের অর্ধেকই নারী তাদের বাদ দিয়ে উন্নত জাতি, উন্নত সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। পরিশেষে শুধু বলতে চাই, কেবল সেমিনার আর কথার মধ্যে বৃত্তবন্দি না থেকে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য আমাদের সবাইকে যুগের চাহিদা পূরণের বাস্তবতার নিরিখে অগ্রসর হতে হবে, তবেই দেশ ও জাতি তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছাতে পারবে।

১৯৯৬ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে। এ কমিটি গঠনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'বিশ্বের জ্ঞান প্রবাহের তুল্যমানের উন্নীত' করার লক্ষ্যে এর 'মৌলিক ও গুণগত পুনর্বিন্যাস'। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ এর রিপোর্টটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উক্ত রিপোর্ট ছিল পূর্ববর্তী সব কয়কটি রিপোর্ট অপেক্ষা অনেক বেশি উদার, সমৃদ্ধ, যুগোপযোগী এবং আধুনিক। কমিটির নারী শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে এদেশে নারী শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হতো।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে শুরুতেই কমিটির রিপোর্টে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা ছিল অত্যন্ত অর্থবহ। এ কাজগুলোর রেশ ধরেই আমরা আমাদের নারী শিক্ষাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। রিপোর্টে বলা হয়, 'পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার,

মনে হয়। এ কমিটিতে যেসব দিক আলোচনা করা হয়েছে অন্য কোন কমিটিতে তা আলোচনা হয়নি। বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তাবনায়ও এ কমিটি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ সকল দিক বিবেচনা করলে এই কমিটির বিচার বিশ্লেষণ প্রশংসার দাবি রাখে।

বর্তমান অবস্থা

নারীশিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্ট কাজ না করলেও আজকাল নারী শিক্ষায় কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। বিশ্বব্যাপী নারীশিক্ষার প্রতি আন্দোলন ও সমর্থন বেড়েছে। মেক্সিকোতে ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৬-৮৫ সালে নারী দশক পালন, ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কনভেনশন, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন, ১৯৮৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন বাংলাদেশেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে নারী সমাজ নিজ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে থাইল্যান্ডের